দলীয় কোন্দলের বলি শতবর্ষী মহররম মেলা

মেহেরপুরের কুতুবপুর গ্রামের শতবছরের ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ মেলা এবার দলীয় কোন্দলের বলি হয়েছে। দীর্ঘদিনের রীতি ভেঙে মেলাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে নেমে এসেছে চরম স্থবিরতা। ঐতিহ্যবাহী এই মিলনমেলা বন্ধের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক বিভেদ ও সমন্বয়হীনতাকে দায়ী করছেন সচেতন এলাকাবাসী।

স্থানীয় দর্শনার্থী আলামিন হোসেন জানান, কুতুবপুরের মেলা কেবল কেনাবেচার স্থান নয়, বরং অত্র অঞ্চলের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের অন্যতম মাধ্যম। শতবর্ষ আগে কৃষিভিত্তিক এই জনপদে পণ্য বিনিময় ও বিনোদনের জন্য মেলাটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। সময়ের পরিক্রমায় এটি এই অঞ্চলের মানুষের কাছে একটি অনন্য উৎসবে পরিণত হয়। কিন্তু এবার সেই ঐতিহ্যবাহী উৎসবের আমেজ ম্লান হয়ে গেছে দলীয় কোন্দলের কারণে।

মেলার খবরে রাজশাহী, নাটোর, লালপুর, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য নিয়ে এসেছিলেন। মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে মেলা বন্ধের খবর শুনে দিশেহারা হয়ে পড়েন তারা। ব্যবসায়ী ছলেমান হোসেন আক্ষেপ করে বলেন, “মেলাকে কেন্দ্র করে বিপুল পরিমাণ পণ্য তুলেছিলাম। মেলা না হওয়ায় সেগুলো বিক্রি হচ্ছে না, সব ব্যবসায়ীই এখন বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়েছেন।” অনেকে লোকসানের আশঙ্কায় তড়িঘড়ি করে এলাকা ত্যাগ করলেও, কেউ কেউ এখনো মেলার আশায় দোকান নিয়ে বসে আছেন।

প্রতিবছর এই মেলায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে। এবছর মেলার খবর না জেনে বিকেল গড়ালেই বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ শিশুসন্তানদের নিয়ে ছুটে আসছেন। মেলার প্রাণচাঞ্চল্য না দেখে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে তাদের। দর্শনার্থী পারভেজ হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “বছরের এই একটি দিনের অপেক্ষায় থাকি আমরা। মেলা অনুষ্ঠিত না হওয়া পুরো গ্রামবাসীর ব্যর্থতা। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের শতবছরের ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে।”
ব্যবসায়ী রুবেল হোসেন জানান, নাগরদোলা থেকে শুরু করে খাবার,

শিশুদের খেলনা ও কসমেটিকসের দোকান—সব মিলিয়ে মেলাটি জমজমাট হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সবকিছুই এখন ম্লান।

এই সংকটের উত্তরণ চেয়ে স্থানীয় সচেতন নাগরিক জুয়েল রানা বলেন, “ঐতিহ্য কোনো দলের নয়, এটি জনগণের সম্পদ। আমি আশা করি, আগামী বছরগুলোতে সকল প্রকার দলীয় কোন্দল ও বিভেদ কাটিয়ে মেলা কমিটি সম্মিলিতভাবে মেলার আয়োজন করবে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে যেন এই ঐতিহ্য পুনরায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, এটিই আমাদের দাবি।”

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে স্থানীয় প্রশাসন ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা উদ্যোগ নিলে অদূর ভবিষ্যতে কুতুবপুর মেলা তার হারানো জৌলুস ফিরে পাবে।

১৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাবিত্রি, হিমসাগর আম ও মেহেরসাগর কলা

দেখতে অনেকটা চমচমের মতো, আকার লম্বা ও চ্যাপটা। খেতেও সুস্বাদু। নাম তার সাবিত্রি। সম্প্রতি মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আবেদনে ভৈগলিক নির্দেশক (জিআই) সনদ পেয়েছে মেহেরপুরের ১৫০ বছরের এতিহ্য এই সাবিত্রি মিষ্টি। অন্যান্য মিষ্টি চিনতে সমস্যা হলেও এক দেখাতে ‘সাবিত্রি’ চেনা যায়। এর গায়ে ‘সাবিত্রি’ লেখা থাকে। এটাই এ মিষ্টির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্য।

জেলার দেড়শ বছরের ঐতিহ্য সাবিত্রি মিষ্টি শুরু থেকেই ধরে রেখেছে স্বাদ ও মান। এর পেছনে জড়িয়ে আছে ব্যবসায়ী ও কারিগরদের মমতা ও পেশাদারিত্ব। তিন পুরুষ ধরে মেহেরপুর শহরে এই ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি তৈরি করে বাজারজাত করছেন বাসুদেব সাহার উত্তরসূরিরা। মিষ্ট্রির জনপ্রিয়তা দেখে এখন অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও সাবিত্রি মিষ্টি তৈরি করেন তবে তাদের মত মান ও স্বাদ করতে পারেন না।

সাবিত্রি মিষ্টির সুনাম দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও জায়গা করে

সাহা বলেন, ‘সাবিত্রী’ মিষ্টি তৈরিতে ব্যবহৃত দুধ কিংবা মিষ্টি ফ্রিজে রাখা হয় না। ফ্রিজে রাখলে স্বাদ আর মান ঠিক থাকে না। প্রতিদিন সংগ্রহ করা দুধ ভারী কাঠ দিয়ে চুলায় জ্বাল করানো হয়। দিনের পুরো সময় ধরে দুধ জ্বাল দিতে হয়। সন্ধ্যার দিকে জ্বাল দেওয়া শেষ হলে তা ঠান্ডা করার জন্য রেখে দেওয়া হয়। পরের দিন সকালে ‘সাবিত্রী’ বানিয়ে বিক্রি করা হয়। প্রতিদিন মিষ্টির যে পরিমাণ অর্ডার পাই, সে অনুযায়ী দুধের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

তিনি বলেন, ‘দুধ-চিনি আর কাঠের দাম বেড়ে যাওয়া এবং সময়মতো দুধের জোগান না পাওয়ায় মাঝে মাঝে সংকট তৈরি হয়। বাপ-দাদার হাতের মিষ্টি তৈরির স্বত্ব অন্য কাউকে দিতে চাই না। যদি কেউ ভেজাল করে, তাহলে দেড়শ বছরের সুনাম ক্ষুন্ন হবে। বিষয়টি মাথায় রেখেই বহিরাগত কাউকে কাজে নেওয়া হয় না।’

অনন্ত সাহা বলেন, আমরা ‘সাবিত্রী’ ও ‘রসকদম’ মিষ্টি তৈরি করে থাকি। দুটোই মেহেরপুরের ঐতিহ্য বহন করে। প্রতিকেজি ‘সাবিত্রী’ ও ‘রস কদম’ ৫৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়।

সাবিত্রী মিষ্টির নিয়মিত ক্রেতা ইয়াসির রহমান বলেন, শুধু আত্মীয়-স্বজনদের জন্য না, বাড়িতে প্রতিনিয়ত খাওয়ার জন্যও এ মিষ্টি কিনে থাকি। এর মত স্বাদ আর অন্য কোন মিষ্টিতে পাই না।

মেহেরপুরের সিনিয়র সাংবাদিক ও জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, মেহেরপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরতে গেলে ‘সাবিত্রী’ মিষ্টির নাম চলে আসে। আমরা ছোট থেকেই এই মিষ্টির সাথে পরিচিত। ব্যবসায়ী ও কারিগরের হাত বদল হলেও জৌলুস আর সুনাম এখনো ধরে রেখেছেন কারিগররা। বাসুদেব সাহা এ মিষ্টির আবিস্কারক হলেও তার দেখাদেখি এখন অনেকেই এ মিষ্টি তৈরি করে, তবে বাসুদেবের মত স্বাদ ও মান অন্যরা করতে পারে না।

জিআই সনদ প্রাপ্তি নিয়ে মাহাবুব চান্দু বলেন, সাবিত্রি, আম বা কলাই নয় মেহেরপুরের আর ও কিছু ঐতিহ্যবাহী পণ্য রয়েছে যেগুলোও জিআই সনদ পাওয়ার উপযুক্ত।

সাক্ষাৎকার বাসুদবে সাহার নাতি অনন্ত

সাহা

১৮৬১ সালে স্থাপিত হয় বাসুদেব সাহা প্রতিষ্ঠাতা তিন পুরুষ মিলে দোকান চালাচ্ছেন, প্রথমে বাসুদেব সাহা, তারপর রাবিন্দ্রনাথ সাহা, এখন বিকাশ সাহা ও অনন্ত সাহা। শুক্রবার সকালে পাওয়া যায় অনন্তসাহাকে । তিনি ক্রেতাদের কাছে মিষ্টি বিক্রি করছিলেন। মিষ্ট্রির বিক্রি ফাঁকে ফাঁকে কথা হয় অনন্ত সাহার সাথে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দিনে কত কেজি মিষ্টি তৈরি করেন? কত কেজি দুধ ও ছানা প্রয়োজন হয়?

অনন্ত সাহা: প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ কেজি মিষ্টি তৈরি করি। এর মধ্যে সাবিত্রি ও রসকদম৷ এই মিষ্টি তৈরি করতে ১৮০ কেজি থেকে ২০০ কেচি দুধ প্রয়োজন হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিন: অনেকে এই মিষ্টি তৈরি করার চেষ্টা করে কিন্তু আপনাদের মতো টেষ্ট হয় না। এবিষয়ে আপনাদের কোন অভিযোগ আছে কি-না?

অনন্ত সাহা: কারো কাছে কোন অভিযোগ নেই, যে যেভাবে কাজ করছে করুক। অনেকেই চেষ্টা করছে কিন্তু আমাদের মত পারেনি ।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চাহিদা থাকা সত্বেও বেশি তৈরি করেন না কোনো.?

অনন্ত সাহা: কাঁচামালের সমস্যা, দক্ষ লোকজনের সমস্যা। এর থেকে বড় সমস্যা হলো বেশি করে তৈরি করতে গেলে মান ভালো থাকে না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: সাবিত্রি মেহেরপুরের মিষ্টি হিসেবে জি আই সনদ পেয়েছে, আপনাদের কেমন লাগছে?

অনন্ত সাহা: অবশ্যই ভালো লাগছে, এটা শুধু আমাদের জন্য না মেহেরপুরবাসীর জন্য গর্বের বিষয় । মিষ্টি নিয়ে সারা দেশে আমাদের সুনাম রয়েছে, এবার সুনামের সাথে সরকারি স্বীকৃতও মিলল।

হিমসাগর আম

সাবিত্রি মিষ্টির সাথে মেহেরপুরের দুটি কৃষি পণ্য হিসেবে হিমসাগর আম ও মেহেরসাগর কলাও পেয়েছে জিআই সনদ। মেহেরপুর জেলা কৃষি

মধ্যে অধিকাংশ কলা মেহের সাগার জাতের। সুস্বাদু জাতরে কলা যার গাছ মজবুত, ফলন ভালো হয় এবং রোগবালাই কম হওয়ায় মহেরেপুর সাগর কলা চাষীদরে কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।◌ে এবং এটি লাভজনক ফসলে পরণিত হয়ছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের কলাচাষী সানোয়ার হোসেন বলেন, মেহের সাগর কলা সুস্বাদু এবং এটি লাভজনক ফসল। এ ফসল চাষের পাশাপাশি সাথি ফসল চাষ করা হয়। তিনি বলেন, আমি ৭ বিঘা জমিতে মেহেরসাগর কলা চাষ করেছি। শুরু থেকে ফসল হার্ভেস্টিং পর্যন্ত এক বছর সময় লাগে। এর মধ্যে ৬ মাসের একটি সাথী ফসল চাষ করা যায়। সব মিলিয়ে যে খরচ হয় তা সাথী ফসলে উঠে আসে। আশা করছি ৭ বিঘা জমি থেকে বছর শেষে আনুমানিক ১০ লাখ টাকা লাভ হবে।

সানোয়ার হোসেন বলেন, মেহেরপুরের কলা উৎপাদন দেখে আশেপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের কাছে থেকে চারা নিয়ে যাচ্ছেন কয়েকবছর ধরে। কিন্তু আমাদের মত তারা ফলন পাচ্ছে না। যে কারণেই মেহেরপুরের জন্য মেহের সাগর বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। নতুন করে জিআই সনদ পাওয়ায় এর কি সুফল আমরা পাবো সেবিষয় এখনো পরিস্কার হতে পারিনি । তবে আশা করছি চাষীরাও উপকৃত হবে।

মেহের সাগর কলা নিয়ে মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবীদ সনজীব মৃধা বলেন, মেহেরপুরে কলা চাষের একটি বড় বাজার রয়েছে। বছরের ১৫০ কোটি টাকা কলা বাজার জাত হয়েছে। ৩০০ হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয় যা থেকে উৎপাদন হয় ১ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন কলা।

সনজীব মৃধা বলেন, যেহেতু আমরা কলা নিয়ে জিআই সনদ পেয়েছি। এখন এটা নিয়ে যাতে কৃষকরা ভালো বাজার পান সে বিষয়ে কাজ করা হবে।

ঐতিহ্যবাহী দর্শনা: নিভে আসছে

আলো”

দশর্না একটি নাম। যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্প ও বাণিজ্যের দীর্ঘ ঐতিহ্য। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১২.৫০ বর্গ কিলোমিটারের এই ছোট্ট শহরটি এক সময় ছিল গৌরবের প্রতীক। সীমান্তবর্তী এই নগরী থেকেই ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর বর্তমান ভারতের রানাঘাট থেকে দর্শনা হয়ে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত রেলপথের আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেন চলাচলের মাধ্যমে রেল পরিষেবার সূচনা ঘটে আজকের বাংলাদেশ ভূখণ্ডে।

বাংলাদেশের প্রথম রেলপথ, ‘দর্শনা’ নামে একটি নগরীর পত্তন। ইতিহাসের পাতা থেকে পাওয়া যায় দর্শনা নামটি ১৮০০ সালের কিছু আগে থেকেই প্রচলিত। ১৭৮৭ সালের ২১ মে মার্চ নদীয়া জেলা গঠিত হয়, তখনও এই স্থানটির নাম দর্শনা ছিল। রেনল্ড গেজেট থেকেও জানা যায় ১৮০০ সালের গোড়ার দিকেও এই অঞ্চলের নাম ছিল দর্শনা। সেইটা কিন্তু আমার এখন যে দর্শনার কথা বলি, সেইটা না! এখন বহুল প্রচলিত দর্শনার পাশেই ‘কোটালি দর্শনা’ নামের একটি গ্রামের নামের খন্ডাংশ থেকে পাওয়া বর্তমান ‘দর্শনা’। সবচে প্রচলিত এবং আলোচিত যা পাওয়া ইতিহাস,- কোটালি দর্শনার একজন ইঞ্জিনিয়ার রানাঘাট থেকে জগতি পর্যন্ত চলাচলের জন্য নির্মিত রেলপথের দায়িত্ব পাওয়া একজন মানুষের কৃতিত্ব। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘বাংলার ইতিহাস’ বই থেকে পাওয়া যায়, ‘রামনগর থেকে ভবানীপুর (ঈশ্বরচন্দ্রপুরের পুরাতন নাম) গ্রামের বুক চিরে পদ্মা নদীর শাখা মাথাভাঙ্গা নদীর পাশ দিয়ে বাষ্পশকট চলাচলের লৌহ নির্মিত পথ নির্মাণের মহাযজ্ঞ চলিতেছে’। তখনও আমাদের এ দর্শনা পায়নি। শোনা যায় কোটালি দর্শনার শ্রদ্ধেয় সেই ইঞ্জিনিয়ার মানুষটির মেধা আর বর্তমান ভারত থেকে আসা হাজার হাজার বিহারি সম্প্রদায়ের মানুষের শ্রম-ঘামের বিনিময়ে নির্মিত হিন্দু জমিদার এস্টেটের ভূমির ওপর মাথাভাঙ্গা নদীর কাটা খালের মুখের জায়গাটা কোটালী দর্শনার মানুষটির দেয়া নামের পত্তন হলো “দর্শনা” নামের এক নগর সভ্যতার। দর্শনা তখন থেকেই শুরু এ অঞ্চলের মানচিত্রের যোগাযোগ, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের এক প্রাণকেন্দ্র।

১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বরের নির্মিত সেই দর্শনার কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আজ আলোর প্রদীপটি ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। শহরের প্রাণবন্ততা কমে এসেছে, পুরনো ঐতিহ্যের জায়গায় এসেছে অব্যবস্থাপনা, উদাসীনতা আর অবক্ষয়। জন কেরু নামের ব্রিটিশ

সাহেবের ১৯৩৮ সালে কেরু এন্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত চিনিকলের হুইসেল বাজত, সেখানে এখন নীরবতা। রেলস্টেশনের কোলাহল ম্লান হয়ে গেছে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ১৯৫২ সালে ১৩.৬৬ একর জমিতে তৎকালীন কাস্টমস ও এক্সাইজ কালেকটরেট খুলনার অধীনে প্রতিষ্ঠিত দর্শনা কাস্টমস কলোনি। এক এলাহি ব্যাপার! রেল-কেরু-কাস্টমস, সব মিলিয়ে ২৪ ঘন্টায় কমপক্ষে ২০ হাজার কর্মজীবী মানুষ ছুটে চলা, আনন্দ-উৎসব।

সে শহরের দোকানপাটে আগের মতো বেচাকেনা নেই। শহরের প্রান্তে দারিদ্র্য আর বেকারত্বের ছায়া ঘন হয়ে উঠেছে।

দর্শনার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও আজ ক্ষয়ে যাচ্ছে। একসময় এখানে নাট্যচর্চা, সাহিত্যসভা, সংগীত-আড্ডা—সব ছিল প্রাণবন্ত। আজ সেসব উদ্যোগ নেই বললেই চলে। তরুণ প্রজন্মের অনেকেই শহরের ইতিহাস জানে না; তারা অন্য শহরের চাকরির টানে বা জীবিকার প্রয়োজনে চলে যাচ্ছে দূরে। ফলে দর্শনার মাটিতে যেই আলোর রেখা একদিন গর্বের সঙ্গে জ্বলেছিল, আজ তা নিভু নিভু।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী শহর দর্শনা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্বে এক সময় ছিল গৌরবময় নাম। এটি কেবল একটি সীমান্তনগরী নয়, বরং বাংলাদেশের প্রথম রেলস্টেশন এবং প্রথম চিনিকল। এই শহর দেশের প্রাচীন শিল্পবাণিজ্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সাক্ষী। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় দর্শনা তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের লালসা, অর্থনৈতিক অনিয়ম, সামাজিক অবক্ষয় ও সাংস্কৃতিক বিভাজন আজ শহরটিকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের লালসা-নৈতিক অবক্ষয় :

দর্শনার রাজনৈতিক ইতিহাস ছিল একসময় সংগ্রামী ও আদর্শনিষ্ঠ। যখন জন কেরু সাহেব চিনিকলের আখ চাষের জন্যে আশ-পাশের জমিগুলো দখল নিয়ে ফার্ম তৈরী শুরু করে তখন উপমহাদেশের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মুজাফফর আহমদ এসে এ অঞ্চলের চাষিদের সংগঠিত করতে জনসভা করেছিলো আজকের বাজার মসজিদ সংলগ্ন বলখেলার ফিল্ডে। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিলো। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববতী সময়ে এখানকার নেতৃত্ব জনকল্যাণ, অবকাঠামো, শিক্ষা ও শিল্পোন্নয়নকে কেন্দ্র করে কাজ করেছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী, বিশেষত ১৯৯১ সালের পর থেকে

বর্তমানে সেই নেতৃত্ব পরিণত হয়েছে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তিস্বার্থে নিমজ্জিত এক গোষ্ঠীতে। দলীয় রাজনীতির প্রভাবে স্থানীয় প্রশাসন, শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক সংগঠন পর্যন্ত—সব ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়েছে পক্ষপাতিত্ব ও দখলদারিত্ব। প্রকৃত জননেতৃত্ব আজ হারিয়ে গেছে দলীয় ‘কর্মী’ ও ব্যবসায়িক সিন্ডিকেটের হাতে। ফলে দর্শনার উন্নয়ন এখন কেবল বক্তৃতা বা ব্যানারে সীমাবদ্ধ, বাস্তবে নয়।

অর্থনৈতিক কাঠামোর ভাঙন; ঐতিহ্যের পতন :

দর্শনার অর্থনীতি একসময় দাঁড়িয়ে ছিল তিনটি স্তম্ভের ওপর—রেলপথ, কেরু অ্যান্ড কোম্পানি এবং সীমান্ত বাণিজ্য।

রেলপথ: ব্রিটিশ আমলে দর্শনা থেকে যে রেল সংযোগ গড়ে ওঠে। এটি ছিল দেশের শিল্পবাণিজ্যের মূলধারা কিন্তু বর্তমানে সেই ঐতিহাসিক রেলপথ অবহেলা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আর লুটপাটে প্রায় অচল। একইভাবে পাকিস্তান পর্বে নির্মিত খুলনা-দর্শনা সংযোগকারী রেলপথ ‘হল্ট ষ্টেশন’ আধুনিকীকরণ তো দূরের কথা, ন্যূনতম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও অনুপস্থিত।

কেরু অ্যান্ড কোম্পানি: ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই চিনিকলটি দেশের প্রথম শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। একসময় হাজারো শ্রমিকের জীবিকার উৎস ছিল এটি কিন্তু আজ সেটি দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, দলীয় প্রভাব ও অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে টিকে থাকার লড়াই করছে। নিয়মিত উৎপাদন বন্ধ, শ্রমিক অসন্তোষ ও আর্থিক সংকট এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে।

কাস্টমস হাউস ও সীমান্ত বাণিজ্য: দর্শনা সীমান্ত বাংলাদেশের অন্যতম ব্যস্ততম স্থলবন্দর। কিন্তু বাণিজ্যের বড় অংশ এখন চলে যায় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। সাধারণ ব্যবসায়ী ও স্থানীয় জনগণ বঞ্চিত হয় সুযোগ থেকে। রাজনীতি ও অর্থনীতির অদ্ভুত মিশ্রণ তৈরি করেছে এক ধরনের দখলদার অর্থনীতি, যা উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।

সামাজিক নেতৃত্বের বিভাজন ও গোষ্ঠীবাদ :

দর্শনার সমাজ একসময় ছিল ঐক্যবদ্ধ ও সহানুভূতিশীল। এখন সেই সমাজ বিভক্ত। সমাজসেবামূলক সংগঠনগুলোতেও দলে-দলে ভাগাভাগি, নেতৃত্ব নিয়ে টানাপোড়েন। কিছু ‘ছদ্মনেতা’ নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে সামাজিক কাজকে ব্যক্তিগত প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে।

ফলে সমাজে নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতার পরিবর্তে বেড়েছে হিংসা, বিভাজন ও অবিশ্বাস।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবনতি ও নীতিহীনতা :

দর্শনার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন— ১৯১৬ সালে মেমনগর বিপ্রদাস উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৬২ সালে দর্শনা বালিকা বিদ্যালয়, ১৯৬৭ সালে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৬২ সালে দর্শনা ডিএস মাদ্রাসা, ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত দর্শনা কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একসময় ছিল উচ্চমানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের কেন্দ্র। আজ সেই প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক প্রভাব, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, এবং ছাত্র সংগঠনের দলীয়করণের কারণে মানহীন হয়ে পড়েছে। শিক্ষা এখন আর মেধা বিকাশের মাধ্যম নয়, বরং ক্ষমতার সোপান। তরুণ প্রজন্ম তাদের নৈতিক ভিত্তি হারাচ্ছে, যা ভবিষ্যতের জন্য বিপদজনক সংকেত।

সাংস্কৃতিক সংগঠনের দলাদলি ও অবক্ষয় :

দর্শনার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একসময় ছিল উজ্জ্বল। নাটক, সংগীত, সাহিত্যচর্চা, নাট্যদল ও পাঠচক্র—এসব ছিল শহরের প্রাণ। এখন সেই সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো দলীয় দ্বন্দ্বে ভুগছে। পাকিস্তান পর্বেও সারাবছর পালাগান-জারিগান, যাত্রা-সার্কাস, কাওয়ালী, গণসঙ্গীতের সুরে মাতোয়ারা থাকতো এ মশহুর শহর।

স্বাধীনতা পরবর্তী স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের জ্বালানি হিসেবে ১৯৮৩ সালে সৃষ্টি অনির্বাণ সাংস্কৃতিক সংগঠন, ১৯৮৬ সালে সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের গণ নাটকের মাধ্যমে সারাদেশে দর্শনাকে এক আইকনিক মাত্রায় দাঁড় করাই সেইসময়ের বিপ্লবীরা । যদিও তারও আগে ১৯৬২ সালেই যে আগুনের সূচনা করেছিলো হিন্দোল সঙ্গীত পরিষদ এবং সীমান্ত সংসদ।

আজ সেখানে সংগঠনগুলোর অন্ত:দ্বন্দ্ব, একটি সংগঠন অন্যটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত, আর প্রকৃত শিল্পীরা হয়ে পড়ছে উপেক্ষিত। সংস্কৃতি এখন আর আত্মার প্রতিফলন নয়, বরং রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রতীক। এখন এক পীর সাহেবের বিষ-নিশ্বাসে আর তার ভাই-ভাগ্নেদের পারিবারিক তালুকদারীতে; পীরের কতিপয় পাছা-চাটা মুরিদের সেরেস্তাদারীতে ঢাকের কাঠি নড়ে।

এর ফলে দর্শনার সৃজনশীল মনন ভেঙে পড়েছে, এবং তরুণ প্রজন্ম দূরে সরে যাচ্ছে শিল্প-সংস্কৃতি থেকে।

স্বাস্থ্যসেবা হয়েছে দানবদের কারখানা :

৫০ হাজার জনসংখ্যার এ নগরে নূন্যতম উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা নেই। জরুরী চিকিৎসা পাওয়ার কোন অধিকার নেই দর্শনার মানুষের। প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে জরুরী সেবা দেবে না। রাত ৯ টার পরে ডাক্তার সাহেবকে পাবেন না। ফোনও বন্ধ। শুধু রাত ৩ টায় ডাক্তার সাহেবকে যদি বলেন, সিজার করতে হবে বা এপেন্ডিস কাটতে। পেয়ে যাবেন! কেরু হাসপাতালে সব সুবিধা পাওয়া যেতো। কিন্তু যে নেতৃত্ব ছড়ি ঘোরাতে তাদের নজর, এটা বন্ধ করে দাও! সিন্ডিকেট বানাও! জনকল্যাণমুখী প্রাইভেট হাসপাতাল বানাও। রাস্তার দু’পাশে যে ডাক্তার…. সাইনবোর্ড লাগিয়ে বসে আছে, খোঁজ নিয়ে দেখে তো কতজনের সত্যিকার ডাক্তারী সার্টিফিকেট আছে –

ভরসা ফার্মেসীগুলো।

ঐতিহ্যবাহী দর্শনার ঐতিহ্য ধ্বংসের কারিগর :

দর্শনা সব মিলিয়ে ছিল এক প্রগতিশীল নগরচেতনার প্রতীক। কিন্তু সময়ের স্রোতে আজ সেই দর্শনা এক মৃত ইতিহাসের পৃষ্ঠা মাত্র। আর এই মৃত্যুর মূল কারিগর কোনো বহিরাগত শক্তি নয়—বরং শহরের ভেতরেই জন্ম নেওয়া কেরানী শ্রেনী মানসিকতার মতলববাজ-বাকোয়াজবাজ এলিট সম্প্রদায়। এই শ্রেণিটি হলো দর্শনার সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরজীবী। এরা রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার নিচু স্তরে থেকে ধীরে ধীরে উপরে উঠেছে, কিন্তু চিন্তা-চেতনায় থেকে গেছে নীচেই। এদের কাছে প্রশাসন মানে সুযোগ, নেতৃত্ব মানে প্রভাব, উন্নয়ন মানে নিজের স্বার্থ রক্ষা। এই কেরানী মানসিকতাই দর্শনার ঐতিহ্যবাহী কাঠামোকে ভিতর থেকে খেয়ে ফেলেছে—যেভাবে ঘুনপোকা কাঠকে খায়, কিন্তু বাইরে থেকে সব ঠিকই দেখা যায়।

এই এলিট সম্প্রদায়,— বাকোয়াজবাজ ও বুদ্ধিজীবক, পাকা অভিনেতা । এরা সভা করে, আলোচনা করে, ব্যানার টাঙ্গায়, পত্রিকায় ছবি ছাপে কিন্তু কাজের নামে করে কেবল প্রহসন। তারা উন্নয়ন শব্দটাকে ব্যবহার করে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের ঢাল হিসেবে আর ঐতিহ্যের কথা বলে পুরনো স্থাপনা ও জনসম্পদ বেচে দেয় ব্যক্তিগত কমিশনের বিনিময়ে। ফলে দর্শনার সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ঐতিহ্য ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে “নথির কবরস্থানে”।

রাজনৈতিক দিক থেকেও এই শ্রেণি ভয়ঙ্কর। তারা কোনো দল বা মত নয়—বরং ক্ষমতার প্রতি আনুগত্যই তাদের একমাত্র আদর্শ। সরকার

বদলায়, রঙ বদলায় কিন্তু এদের মুখের হাসি বদলায় না। কারণ এরা জানে,- যে-ই আসুক, তাদের প্রয়োজন এই ‘অফিস-স্মার্ট’ কেরানী শ্রেণির। ফলে দর্শনার রাজনীতি বা সমাজ কিংবা সংস্কৃতি এখন আর নীতির নয়—এখন তা নেটওয়ার্ক, কমিশন, আর আত্মস্বার্থের সমীকরণ। সামাজিক দিকেও তাদের প্রভাব গভীর। এই শ্রেণি দর্শনার তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষা দিয়েছে কীভাবে আদর্শ নয়, পরিচয়ই জীবনযাত্রার মূলধন। তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে পরিণত করেছে তোষামোদের উৎসবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বানিয়েছে পদোন্নতির সিঁড়িতে।

কত তার বাহারি নাম- নাগরিক কমিটি, বাস্তবায়ন কমিটি, আন্দোলন, ঐক্য, জইন্ন্যে আমরা আর একটা শ্রেনী আছে!

যারা দর্শনার মানুষ বলে রাজধানীর বুকে বছর বছর মিলনমেলায় হাজির হয়ে ডায়াসে দাঁড়িয়ে কিংবা কফির কাপ হাতে এসে বলে, …. কেমুন আছো–, এখন কি করচ্ছো— আচ্ছা, আপনার তো সরকারের বড়-বড় আমলা ছিলেন। তাই না?

কেউ সচিব, কেউ মহাপরিচালক, কেউ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কেউ চীফ কনসালটেন্ট আরো, আরো, আরো…….। আপনারা তো ইচ্ছে করলেই দর্শনা অঞ্চলের আপনার অধীনস্ত দফতরেই বা আপনার লিংকের একটা একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি দিতে পারতেন এ শহরের একজনকে । ১৯৯০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত আপনারা যতজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন তারা যদি আজ প্রতিটা ঘরে একজন করে অন্তত সরকারী চাকুরীর বন্দোবস্ত করে দিতেন তাহলেও দর্শনার বর্তমান ৫০ হাজার জনসংখ্যার শহরে ৫ হাজার সরকারি চাকুরে থাকতো। টাকা নিয়েই দিতেন! এইটা তো এখন সিস্টেম। ইচ্ছে করলেই আমি বা আপনি যেতে পারবো না। কিন্ত আপনি দেননি, করেননি। আবার আপনি যে খুবই সৎ মানুষ তাও না। টাকা আপনি নিয়েছে। চাকরিও দিয়েছেন। সেইটা কই? শশুড়বাড়ী এলাকায় কিংবা অন্য এলাকায়।

দর্শনা হারিয়েছে তার মূল্যবোধ, আত্মসম্মান ও নাগরিক ঐক্যের চেতনা। তবু আশার জায়গা আছে। যে সমাজে ধ্বংসের চোরাগোপ্তা শক্তি প্রবেশ করে, সেই সমাজের অন্তঃস্থলে একদিন প্রতিরোধের আগুনও জ্বলে ওঠে। দর্শনার ঐতিহ্য একদিন হয়তো পুনর্জন্ম নেবে—যেদিন এই কেরানী মানসিকতার মতলববাজ ও বাকোয়াজবাজ এলিট সম্প্রদায়ের মুখোশ খুলে যাবে, সেদিন দর্শনা আবার হবে প্রগতির প্রতীক, মানুষের শহর।

আর কিছু আশা করার নেই পুরোনোদের কাছ থেকে :

যারা দশকের পর দশক এই শহরকে শাসন করেছে, তারা আজও নিজেদের ভুল স্বীকার করতে পারে না।

তারা এখনো “আমি করব”, “আমরা উন্নয়ন এনেছি” বলে প্রচারণা চালায়—কিন্তু বাস্তবতায় দর্শনা প্রতিদিন আরও পেছনে পড়ে যায়। তাদের কাছ থেকে এখন আর কিছুই আশা করার নেই। কারণ তারা শহর নয়, নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়েছে; মানুষ নয়, নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করেছে।

কিছুদিন আগে এ জেলার একজন শীর্ষস্থানীয় নেতার সাথে গল্প করতে করতে তিনি দারুণ কথা বলল,’তোমরা গত ১৫/১৬ বছরে দর্শনার বাইরের মানুষদের কখনো মানুষ হিসেবেই গণ্য করোনি। এমপি তোমাদের, জেলা পরিষদ তোমাদের, উপজেলা তোমাদের, সেক্রেটারী তোমাদের, প্রেসিডেন্ট তোমাদের… সবই তোমরা। মিছিল করার, মিটিং করার, মহড়া করার সময় আমরা। আমাদের প্রয়োজন গেলে সারারাত বসিয়ে রেখে রাত ৪ টায় দেখা দিয়ে কও তাড়াতাড়ি বল…ঘুমাবো..।

এবার দেখবো তোমরা কি করো!

হয় জীবননগরে ফেলা হবে।

না হয় আন্দুলবাড়িয়া!

একদম শূন্য করে দেয়া হবে।

দর্শনার বর্তমান সংকটের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো—নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থার মৃত্যু।

পরিবর্তনের দায়িত্ব তরুণদের হাতে:

এখন যদি কিছু করার সুযোগ থেকে থাকে, তবে সেটি তরুণদের হাতে। যাদের বয়স এখন সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ ৪০ বছর, যাদের মনে এখনো আদর্শের আগুন, সৎ থাকার সাহস এবং নতুন করে ভাবার শক্তি আছে—তাদেরই নিতে হবে দায়িত্ব। তরুণরা যদি রাজনীতিকে ব্যবসা না বানিয়ে জনসেবার মঞ্চ বানায়, যদি সমাজের ভাঙা বন্ধন জোড়া লাগায়, যদি শিক্ষায় নৈতিকতা ফিরিয়ে আনে, আর সংস্কৃতিতে সত্য ও মানবতার চর্চা করে—তবেই দর্শনা আবার জেগে উঠতে পারে।

এই প্রজন্মের তরুণদের দরকার “আমি পারব” নয়, বরং “আমরা পরিবর্তন আনব”—এই বিশ্বাস।

দর্শনার আলো আবার জ্বলবে তখনই, যখন তরুণরা পুরোনো মুখগুলোর তোষামোদি রাজনীতি ভেঙে নিজেদের সততা ও দক্ষতার মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব গড়ে তুলবে।

পুরোনোরা হারিয়েছে, নতুনরা সেটা ফিরে পেতে পারে :

দর্শনার অতীত গৌরবকে হারিয়েছে একদল আত্মস্বার্থপর নেতৃত্ব। তাদের হাতে রাজনীতি হয়েছে নাটক, অর্থনীতি হয়েছে ব্যবসা, সংস্কৃতি হয়েছে প্রদর্শনী, শিক্ষা হয়েছে কারচুপি, আর স্বাস্থ্যসেবা হয়েছে দানবদের কারখানা।

কিন্তু আশার কথা—দর্শনার মাটি এখনও উর্বর, তরুণদের হৃদয় এখনও সৎ। যদি তারা চায়, তবে তারা পারবে—এই শহরকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে, সততা, সৃজনশীলতা ও সম্মিলিত নেতৃত্বের আলোয়। কারণ ইতিহাসের সব বড় পরিবর্তনই শুরু হয়েছে তরুণদের হাত ধরে। দর্শনাও তার ব্যতিক্রম নয়।

দর্শনার ভবিষ্যৎ এখন তরুণদের হাতে—যারা এখনো বিশ্বাস করে যে পরিবর্তন সম্ভব, যদি কেউ সত্যিই চায়।

দর্শনা একসময় ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আলোকবর্তিকা। আজ সেই আলো নিভে আসছে—নেতৃত্বের লোভ, অব্যবস্থাপনা ও মূল্যবোধের সংকটে। তবে পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা এখনও রয়েছে। যদি স্থানীয় জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়, যদি তরুণ

প্রজন্ম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি সচেতন হয়, এবং যদি সত্যিকারের নৈতিক নেতৃত্ব সামনে আসে—তবে দর্শনা আবারও জেগে উঠতে পারে নতুন আলোয়।

ঐতিহ্য হারিয়ে গেলে একটি শহর কেবল ভূগোল হয়ে থাকে; কিন্তু ঐতিহ্য ফিরে এলে সেটি হয়ে ওঠে ইতিহাসের প্রতিধ্বনি।

লেখক: আব্দুস সামাদ আজাদ বিপু

নিউজ এজেন্সি

মেহেরপুরের বিখ্যাত হিমসাগর আমসহ আম-দই-চিঁড়া-মিষ্টি উৎসব

ঈদের ছুটিতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাড়ি ফিরে আসা প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা মেহেরপুর সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে গত পাঁচ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত ‘আম-দই-চিঁড়া-মিষ্টি উৎসব’ উদযাপন করেছেন।

শনিবার (১৪ জুন) প্রাণবন্ত এই মিলনমেলায় তারা পুরোনো স্মৃতি ভাগাভাগি করেন এবং আনন্দ-উৎসব করেন।

এবারের আয়োজনের প্রধান আকর্ষণ ছিল মেহেরপুরের বিখ্যাত হিমসাগর আম। এই আম তার রসালো স্বাদ, গন্ধ ও মিষ্টতার কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশংসিত। সঙ্গে পরিবেশিত হয় খাঁটি দই, ভেজানো চিঁড়া, দেশি মিষ্টান্ন, পিঠা ও মৌসুমি ফল।

উৎসবে তরুণ ও প্রবীণ প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। তারা একে অপরের সঙ্গে কলেজ জীবনের স্মৃতিচারণ করেন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন।

প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, “হিমসাগর আমের রসালো স্বাদ আর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে এই আয়োজনটি আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।”
অন্য একজন তরুণ অংশগ্রহণকারী যোগ করেন, “কলেজ জীবনের বন্ধুত্ব নতুন করে জেগে উঠেছে, আর এই মিলনমেলা আমাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে।”

আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন স্টুডেন্ট কেয়ার একাডেমির পরিচালক মোঃ আক্তারুজ্জামান হীরা, কুতুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এবং উদ্যোক্তা রাজু আহম্মেদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জজ কোর্টের পেশকার হাসানুজ্জামান মিলন, জারাফাত, নাফিউল, আল-আমিন, রোকুনুজ্জামান তুষার, নোমানসহ আরও অনেকে।

আয়োজকরা জানান, “আগামী বছর আরও বৃহৎ ও সংগঠিতভাবে এই উৎসবটি আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।”

এভাবে প্রতিবারের মতো এবারও মেহেরপুর সরকারি কলেজে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা হয়ে উঠেছে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে।

ঝিনাইদহে দেওয়ালে গ্রাফিতি লিখন করছে শিক্ষার্থীরা

ঝিনাইদহ শহরের প্রধান সড়কসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে গ্রাফিতি ও দেওয়াল লিখন কার্যক্রম করছেন শিক্ষার্থীরা। লিখছেন সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন প্রতিবাদী লিখন।

মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) সকাল থেকে জেলা শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিষ্কার করার পাশাপাশি দেওয়ালে দেওয়ালে গ্রাফিতি, দেওয়াল লিখন ও মোছার এ কার্যক্রম চালান তারা।

শিক্ষার্থীরা জানান, দেয়ালগুলো আমরা রঙ্গিন করে সাজাতে চাই। দেশের বীরত্বগাথা দিয়ে ভরে ফেলতে চাই। আমাদের শহরটাকে আমরা আমাদের মনের মতন করে সাজাবো।

শিক্ষার্থীরা আরও জানান, দেওয়ালকে বর্ণমালা আর ছবিতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছেন তারা। তারুণ্যের শক্তিতে বাংলাদেশ জেগে উঠেছে। প্রাণের টানে তারা এসেছেন, কাজ করছেন। অন্যায় প্রতিরোধ ও দেশ গড়ার কাজে তারা কখনো পিছিয়ে থাকবেন না।
এছাড়াও দেয়ালে নতুন করে আঁকছেন ইসলামি ক্যালিগ্রাফিসহ বিভিন্ন শিল্পকর্ম। সেই সঙ্গে দেশ সংস্কারের শ্লোগানও লিখছে তারা। রং নিয়ে ব্রাশের মাধ্যমে শহরের প্রধান সড়কসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেওয়াল রঙ্গিন করে তোলা হচ্ছে।
শিক্ষার্থী সাজিদ মাহমুদ জানায়, এই লিখনীতে তুলে ধরা হচ্ছে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে সহায়তা করবে।

ঝিনাইদহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিলুপ্ত গ্রামীণ খেলা

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে শেফালী আমিন ফাউন্ডেশনের আয়োজন দিনভর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নানা রকম খেলার প্রতিযোগিতা।

বড় একটি বৃত্তের মধ্যে দাড়িয়ে আছে ৭ জন শিক্ষার্থী। তাদের থেকে একটু দুরে আরেটি বৃত্তে পৌঁছাতে হবে নির্ধারিত এক শিক্ষার্থীকে। কিন্তু তাকে বাঁধ সাধছে প্রতিপক্ষ আরও ৭ জন শিক্ষার্থী। বৃত্তের ভেতর অবস্থানকারী দলের একজন করে চি দিয়ে বৃত্তের বাইরের দলের সদস্যদের তাড়া করছে। প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে দিতে পারে তবে সে আউট হবে। এর মাঝে নির্ধারিত শিক্ষার্থী দুরের বৃত্তে পৌঁছাতে পারলে হবে একটি গেম। যার নাম বৌচি খেলা। অপরদিকে চলছে স্লো সাইকেল রেচ। যাতে অংশ নেয় অর্ধশত শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ অতিথিরা। নির্ধারিত দুরুত্বে সাইকেল থেকে পা না নামিয়ে সবার শেষে যেতে পারলে সে হচ্ছে প্রথম।

এমনই গ্রামীণ সব খেলার আয়োজন হয়ে গেলো ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের পারদখলপুর কলিম উদ্দিন বিশ্বাম একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। দিনভর এমন আয়োজনে অংশ নেয় শত শত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা।

প্রায় হারিয়ে যাওয়া গাদন বা গাদি খেলায় অংশ নেয় শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসী। সিনিয়র জুনিয়র দু’গ্রুপে ভাগ হয়ে অংশ নেয় তারা। একটি ঘর থেকে বের হয়ে ৩ টি বাধা অতিক্রম করে আবারো সেই ঘরে পৌছানোর উত্তেজনাপুর্ণ এই খেলা। হাত তালি দিয়ে এতে উৎসাহ দেন শত শত দর্শক।

শেফালী আমিন ফাউন্ডেশনের আয়োজন দিনভর অনুষ্ঠিত হয় নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এতে অংশ নিতে পেরে ও খেলা দেখে অভিভুত শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসী।

কলিম উদ্দিন বিশ্বাম একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর

শিক্ষার্থী মিম আক্তার জানান, গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নানা রকম খেলা আমাদের বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমরা অনেক আনন্দ উপভোগ করছি। যা আমার খুব ভালো লাগছে।

পারদখলপুর গ্রামের বাসিন্দা আবুল কালাম জানান, অনেক দিনপর গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া গাদন বা গাদি খেলা দেখার জন্য এখানে এসেছি। খেলাটি দেখে আমি অনেক আনন্দ উপভোগ করেছি। তাই এমন সুন্দর একটি আয়োজন করায় আয়োজকদের আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। একইসাথে আগামীতে এমন আয়োজন করবেন বলে আশা করি।

শেফালী আমিন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অনুষ্ঠানের আয়োজক মেজর (অব:) মাহফুজুর রহমান জানান, আলোকিত ও বিকশিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যেই আমার এই আয়োজন। আগামীতেও ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুন্ডু উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে এ ধরণের আয়োজন পর্যায়ক্রমে করা হবে বলে জানান তিনি।

দিনভর অনুষ্ঠিত নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যানেল ঝিনাইদহ ভিশনের সম্পাদক ও আনন্দ টিভির ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জাফিরুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় কলিম উদ্দিন বিশ্বাম একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিণাকুন্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আক্তার হোসেন, দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, সোনাতনপুর পুলিশ ফাড়ির ইনর্চাজ চঞ্চল হোসেনসহ শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসী।

দিনভর আয়োজনের মধ্যে ছিলো দাঁড়িয়া বাধা, বৌচি, সুচে সুই পরানো, বালিশ বদল, দড়ির উপর লাফ, ভারসাম্য দৌড়, অঙ্কের দৌড়, দাবা খেলা, মোরগ লড়াইসহ নানা গ্রামীণ খেলায় অংশ নেয় কলিমউদ্দিন বিশ্বাস একাডেমিসহ ওই এলাকার ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩ শতাধিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। খেলা শেষে বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেওয়া বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার খেজুরের গুড় হারাচ্ছে ঐতিহ্য থাকছে না গুড় ও পাটালির আসল স্বাদ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলাসহ পুরো এলাকায় বইছে হিমেল হাওয়া। গত এক সপ্তাহে জেলায় বেশ কয়েকদিন রেকর্ড করা হয়েছে দেশের সর্বনিন্ম তাপমাত্রা। দিনের বেলায় মিষ্টি রোদের উপস্থিতি থাকলেও রাতে পড়ছে তীব্র শীত। শীত মৌসুমের শুরু থেকেই দামুড়হুদার গাছিরা খেজুর রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন।

এবার খেজুড় গুড় তৈরির জন্য অনুকুল আবহাওয়া ও গুড়ের বাজারদর ভাল থাকায় গাছিদের মুখে ফুটে উঠেছে রসালো হাসি। বাড়ি বাড়ি চলছে খেজুর গুড়ের তৈরি আবহমান গ্রামবাংলার ঐতিহ্য পিঠা-পুলির উৎসব। প্রতি বছরই শীতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ উপজেলার গ্রামাঞ্চলে সকাল হলেই খেজুর রস, পিঠা ও নলেন গুড়ের মৌ মৌ গন্ধে ভরে ওঠে পুরো এলাকা। শীতের সকালে খেজুরের ঠান্ডা রস পান করা যে কতটা তৃপ্তিকর তা বলে বোঝানো যায় না।

আর খেজুর রসের পিঠা পায়েস যে কেমন মজাদার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতি বছরের মতো এবারও শীতের শুরুতেই গ্রামাঞ্চলে খেজুর রসের ক্ষীর, পিঠা, পায়েস, তৈরির ধুম পড়ে গেছে। প্রতিদিনই কোন না কোন বাড়িতে চলছে খেজুরের রস ও গুড়ের তৈরি নানারকম খাবারের আয়োজন।

শীতের সকালে বাড়ির উঠানে বসে পিঠে মিষ্টি রোদ লাগিয়ে খেজুরের গরম গরম ঝোলা গুড় দিয়ে রুটি খাওয়ার ভিন্ন স্বাদ। একবার খেলে তার স্বাদ মুখে লেগে থাকে অনেকদিন পর্যন্ত।খেজুর গুড় দিয়ে তৈরি হয় সুস্বাদু পাটালি। নতুন ধানের মুড়ি আর পাটালি খুবই মুখোরোচক খাবার।খেজুরের নলেন গুড় ছাড়া শীতকালিন পিঠা-পায়েস এর উৎসবের কথা ভাবাই যায় না। আগেকার দিনে শীত মৌসুমে উপজেলার গ্রামাঞ্চলের মানুষের সকালের নাস্তা হতো নতুন ধানের চিড়া, ঘরে পাতা দই আর খেজুরগুড় দিয়ে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় নানারকম খাবারের ভিড়ে সেসব আজ শুধুই স্মৃতি।

সূত্রে জানা গেছে, এক সময় দামুড়হুদা উপজেলাসহ জেলার আলমডাঙ্গা ও জীবননগর উপজেলার সব অঞ্চলই খেজুর গুড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। দেশের

ভেজালের কারনে মানুষ খেজুর গুড় খাওয়ার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে।

কয়েক বছর যাবৎ গুড়ে ভেজাল দেওয়া ও সেই সাথে আসল গুড়ের উৎপাদন কমে যাওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব।তাই ভেজাল গুড় উৎপাদনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক হস্থক্ষেপ কামনা করেছেন ভোক্তাসাধারণ। তবে এত প্রতিকূলতার মাঝেও এখনও অনেক পুরাতন গাছিরা অন্যান্য কাজের সাথে ভাল খেজুর গুড় তৈরি করে এর ঐতিহ্য ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

খেজুর গাছ আমাদের রস ও গুড় দেওয়া ছাড়াও ছায়াদান, জ্বালানি সরবরাহসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে নানাভাবে উপকার করে থাকে। তাই এ গাছ থেকে সুমিষ্ট রস গুড় পেতে, আমাদের জীবনের প্রয়োজনে পরিবেশ বাঁচাতে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে আমাদের উচিত নির্বিচারে খেজুর গাছ কাটা বন্ধ করা ও সেই সাথে আরও বেশি বেশি করে খেজুর গাছ রোপণ করা।

নীলচাষিদের আর্তনাদের স্মৃতি চিহৃ ‘আমঝুপি নীলকুঠি’

“ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে মীরজাফর ও ষড়যন্ত্রীদের শেষ বৈঠক হয়েছে এবং তার ফলে শুধু নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিপর্যয় ঘটেনি বাঙালী হারিয়েছিলো তার স্বাধীনতা।’’

এই জনশ্রতি দিয়েই ঐতিহাসিক স্থাপনা আমঝুপির নীলকুঠির কালিমা লেপে ইতিহাস বিকৃতি করা হলো ১৯৭৯ সালের ২৬ মার্চ। তৎকালীন বৃহত্তর কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আব্দুল মান্নান ভূইয়াঁর একটি ফলক নীলকুঠিতে স্থাপন করার পর থেকে এই নীলকুঠিসহ পুরোগ্রামটিকে ষড়যন্ত্রীদের অংশি হিসেবে ইতিহাসের কালো অধ্যায় রচনা করা হলো। জেলা প্রশাসকের নির্দেশে ইতিহাস বিকৃতি করে একটি বই লিখে তাকে সহযোগীতা করছিলেন লেখক আবুল আহসান চৌধুরী।

বিভিন্ন লেখকের বই থেকে জানা গেছে, ১৮১৮ থেকে ১৮২০ খৃস্টাব্দের

মধ্যবর্তী সময়কালে মেহেরপুরের আমঝুপি, ভাটপাড়া, কাথুলি, বামন্দীসহ বেশকিছু স্থানে নীলকুঠি স্থাপিত হয়।

ইতিহাস বলে, ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনাপতি লর্ড ক্লাবের নেতৃত্বে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন এবং বাংলা তার স্বাধীনতা হারায়। পলাশীর যুদ্ধে কয়েকবছর পর লর্ড ক্লাইভ ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান এবং ১৭৭৪ সালের ২২ নভেম্বর তিনি ইংল্যাণ্ডে আত্মহত্যা করেন।

কিন্তু বিকৃত ইতিহাসে জনশ্রুতির দোহায় দিয়ে বলা হয়েছে, পলাশীর যুদ্ধের আগে মাঝে মধ্যে লর্ড ক্লাইভ আমঝুপি নীলকুঠিতে আসতেন এবং এই নীলকুঠিতে মীরজাফরের সাথে ষড়যন্ত্রের বৈঠক করে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হারানোর নীল নকশা করেন। যে নীলকুঠি জন্ম হয় ১৮১৮ সালে অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের ৬১ বছর পর। সেই নীলকুঠিকে কিভাবে লর্ড ক্লাইভ-–মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের নীলনকশার বৈঠকখানা বলা হয় ?



নীলকুঠির ভবনের উত্তর দিক

নীলকুঠি কেন স্থাপন করা হয়

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে এ বঙ্গে কোম্পানী আইন প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই সময় মেহেরপুরসহ সমগ্র নদীয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাষনভুক্ত হয়। পরবর্তিতে ১৭৭৮ সালে ক্যারেল ব্লুম নামের এক ইংরেজ মেহেরপুর সহ বিভিন্ন স্থানে নীল চাষ শুরু করেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের ব্যবসায়ীক প্রসারের কারণে উনিশ শতকের শুরুর দিকে আমঝুপি নীলকুঠিসহ বিভিন্ন স্থানে অবকাঠামো নির্মাণ করে। ইংরেজ কুঠিয়াল কেনি, সিম্পসেন, ফার্গুসেনের সতীর্থদের অত্যাচার আর শোষণের

স্থান ছিলো এই নীলকুঠি।

নীলকরদের অত্যাচার আর নির্যাতনের সাক্ষী আমঝুপি নীলকুঠি। কর পরিশোধ না করতে পারলে নীলচাষিদের উপর চলতো নানা নির্যাতন, এমনকি হত্যা করে লাশ মূত্যুকুপে নিক্ষেপ করে উল্লাস করা হতো। নীলকুঠিতে এখনো সে সকল নির্যাতনের স্মৃতি চিহৃ আকাশে বাতাসে বয়ে বেড়ায়। শুনশান নিরবতায় প্রাকৃতিক নির্জনতার প্রতিটি পরতে রয়েছে সে নির্যাতনের ক্ষত চিহৃ।

জানা যায়, অত্যধিক লাভজনক হওয়ায় ১৭৯৬ সালে মেহেরপুর অঞ্চলে নীল চাষ শুরু হয়। এ সময় বিখ্যাত বর্গী দস্যু নেতা রঘুনাথ ঘোষালির সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে গোয়ালা চৌধুরী নিহত হলে মেহেরপুর অঞ্চলে রানী ভবানীর জমিদারীভুক্ত হয়। রানী ভবানী নিহত হলে কাসিম বাজার অঞ্চলটি ক্রয় করেন হরিনাথ কুমার নন্দী। পরে হাত বদল হয়ে গোটা অঞ্চলটি মথুরানাথ মুখার্জির জমিদারীভুক্ত হয়। এক সময় মথুরানাথ মুখার্জির সঙ্গে কুখ্যাত নীলকর জেমস হিলের বিবাদ বাধে। মথুরানাথ-এর ছেলে চন্দ্র মোহন বৃহৎ অঙ্কের টাকা নজরানা নিয়ে মেহেরপুরকে জেমস হিলের হাতে তুলে দেন। চন্দ্র মোহনের ছেলে মহেষ মুখার্জি জেমস হিলের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ইতিহাসে ইনিই নীলদর্পণ নাটকে গুপে দেওয়ান নামে পরিচিত।

নীল গাছ পচা পানি জ্বালিয়ে তৈরি করা হতো নীল রঙ। এক বিঘা জমিতে আড়াই থেকে তিন কেজি নীল উৎপন্ন হতো- যা উৎপাদন করতে ব্যয় হতো ১২-১৪ টাকা। অথচ চাষীরা পেতো মাত্র তিন-চার টাকা। চাষীদের দাদন দিয়ে নীল চাষে বাধ্য করা হতো যাতে তারা জমিতে নীল চাষ বাদি দিয়ে অন্য চাষ না করতে পারে। ফলে বলা হয়, নীল গাছ থেকে যে রঙ তৈরি করা হতো তা ছিল চাষীদের বুকের পুঞ্জ্ভিূত রক্ত। জমাটবাঁধা ক্ষোভে নীলচাষিরা আস্তে আস্তে আন্দোলন গড়ে তোলে। এক সময় দুর্বার আন্দোলনে নীলকররা আমঝুপি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

আমঝুপি নীলকুঠি নীলকরদের শত অত্যাচারের একটি ঐতিহাসিক স্থান। নীলকুঠিয়াল মিকেনী, সিম্পসন, ফার্গুসেন, জেমস হিল এদের আনন্দের হোলি আর কৃষকদের নির্যাতিত হওয়ার কাহিনী আমঝুপি নীলকুঠির আকাশে-বাতাসে এখনো জড়িয়ে আছে।

আমঝুপি বাজার থেকে দক্ষিণ দিকে আধা কিলোমিটার পিচঢালা পথ যেতেই নীলকুঠির প্রধান ফটক দেখা যাবে। খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের উদ্যোগে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ডিসি ইকোপার্ক নির্মাণের

উদ্যোগে নেওয়া হয় ২০১৮ সালের দিকে। সে সময় এই ফটকটি নির্মাণ করা হয়। ইকোপার্কের জন্য নীলকুঠির স্থাপনাগুলো কিছু সংস্কার করা হয়। তবে পার্কটি শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। প্রধান ফটক পেরিয়ে সড়ক বরাবর সেই নীলকরদের শোষণের স্মৃতিচিহৃ নীলকুঠি ভবন। ভবনের আগে সড়কের দুই পাশে আম ও লিচুর বাগান। ভবনের উত্তর দিকে কাজলা নদী। কাজলা নদীর সাথে ব্রীজের মাধ্যমে ভবনের সংযোগ রয়েছে। নীল উৎপাদন করতে প্রচুর পানি লাগতো এবং যোগাযোগ সহজ করার জন্য নীলকুঠিগুলো ইংরেজরা বানিয়েছিলো নদীর পাড়ে। নীলকুঠিতে পৌছালেই এক প্রাকৃতিক নির্জনতা লক্ষ্য করা যায়। নীলকুঠির বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের সেই নীল গাছ চোখে পড়ে। সারি সারি নারিকেল গাছ চোখ জুড়াবে। ভবনের উত্তর-পূর্ব দিকে দুটি বড় আকারের কড়ুই গাছ পুরো নীলকুঠির সৌন্দর্য্যকে আকড়ে ধরে রয়েছে। আম, লিচুসহ বিভিন্ন গাছে পাখিদের আনাগোনা বেশ। একটু কান পাতলেই পাখিদের ডাক শোনা যায়। কখনো কখনো মনে হয় নিজর্নতায় নীলচাষীদের করুণ আর্তনাদও শোনা যাচ্ছে।



নীলকুঠি ভবন থেকে কাজলা নদীতে যাওয়ার ব্রীজ

নীলকুঠির মূল ভবনে যা আছে

আমঝুপি নীলকুঠির মূল ভবনটি আয়তাকার আকৃতির। নদীপথের যাত্রার সুবিাধায় ভননটি কাজলা নদী মুখ করে উত্তরমুখী করা হয়। তবে বর্তমানে দক্ষিনমুখী হয়ে প্রবেশ করতে হয়। ভবনটিকে দুদিক থেকেই সামনের দিকে মনে হয়। ৩৭ মিটার দৈঘ্য এবং ২২ মিটার প্রস্থের এ ভবনটিতে ছোটবড় ১৩টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শয়ন কক্ষ, নাচঘর, স্নেকপ্রুফ কক্ষ, মৃত্যুকুপ। প্রচলিত আছে, ইংরেজদের মনোরঞ্জনের জন্য নতর্কীদের নাচতে হতো। কোন প্রজা খাজনা কিংবা

নীলচাষে অনীহা প্রকাশ করলে তাকে হত্যা করে মূত্যুকুপে নিক্ষেপ করা হতো। স্নেকপ্রুফ কক্ষটি এত মসৃণ যে সাপ কিংবা পিপড়া চলতে পারবে না। নীলকুঠিতে আরো রয়েছে পুরাতন রেকর্ড রুম, কয়েদখানা, কাচারী ঘর, নায়েবদের আবাসন।

১৯৭৮ সালে ভবনটিকে নতুন করে ৮২ লাখ টাকা খরচ করে সংস্কার করা হয় এবং পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এলাকার উন্নয়নের নাম করে তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক আব্দুল মান্নান ভ’ইয়া ১৯৭৯ সালের ২৬ মার্চ ওই বিকৃত ইতিহাসের ফলক লাগিয়ে দেন ভবনটিতে। পরবর্তিতে ২০১৭ সালে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধিনে প্রথ্নতত্ত্ব অধিদপ্তর নীলকুঠি মূলভবন সহ ৩ একর ৬১ শতক জমি অধিগ্রহণ করে। ভবনটির ভিতরে নতুন করে কিছু সংস্কার করা হয় এবং একটি জাদুঘর করা হয়। তবে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে বাকি ৬১ একর জমি। পরিচর্যার অভাবে বাগানের জৌলুস হারাচ্ছে।
ঐতিহাসিক এ নীলকুঠিতে প্রায় প্রতিদিন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা যান। বছরে প্রায় ২০ হাজার পর্যটক নীলকুঠি পরিদর্শন করেন। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে নীলকুঠিকে প্রসারিত করতে হলে কিছু সুবিধা বাড়ানোর দাবী জানিয়েছেন তারা।

নীলকুঠি চত্বরে দীর্ঘদিন ধরে চায়ের টং দোকান দিয়ে ব্যবসা করছেন সামসুল হক মিলন। চা খেতে খেতে মিলনের সাথে কথা হয় নীলকুঠি সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে । মিলন বলেন, সপ্তাহে সাধারণত শুক্রবার ও শনিবার পর্যটক আসে। মহিলা পর্যটকদের জন্য অসুবিধা পড়তেই হয়। এখানে কোন টয়লেটের (ওয়াশরুম) ব্যবস্থা নেই। অনেকটা বাধ্য নীলকুঠির পাশের একটি বাড়িতে নিয়ে তাদের সে ব্যবস্থা করতে হয়। মিলন আরো বলেন, ২০১৮ সালে সরকারিভাবে একটি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু পানির ব্যবস্থা না করতে পারায় সেটা নাকি উদ্বোধন করা গেল না।

মেহেরপুরের সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিক, সাহিত্যিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ও স্থানীয়রা বারবার আমঝুপি নীলকুঠির বিকৃতি ইতিহাসের ফলক মুছে সঠিক ইতিহাসে স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু আজও সে ফলক রয়ে গেছে।



নীলগাছ

কিভাবে যাবেন আমঝুপি নীলকুঠি

ঢাকাসহ দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে বাসযোগে মেহেরপুর জেলা শহেও আসতে হবে। জেলা শহর থেকে ৭ কিলোমিটার পূর্বে আমঝুপি নীলকুঠির অবস্থান। জেলা শহর থেকে রিক্সা বা ইজিবাইকে করে খুব সহজেই যেতে পারবেন নীলকুঠিতে। সপ্তাহে প্রতি রবিবার পূর্নদিবস এবং সোমবার দুপুর ২টা পর্যন্ত বন্ধ থাকে নীলকুঠির মূলভবন। অন্যান্য দিন সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ১০ টাকা প্রবেশ ফি দিয়ে ঘুরে দেখতে পারবেন ঐতিহাসিক নীলকুঠি ভবনটি।